চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের ভাষা

লোকসাহিত্যকে বলা হয় সংহত সমাজের সৃষ্টি। তার ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত কথ্য উপভাষা। যে উপভাষায় লোকসমাজ কথা বলে লোকসাহিত্য সেই উপভাষাতেই রচিত হয়। উচ্চতর সাহিত্যের ভাষা যেমন সর্বজনবোধ্য মান্য চলিত বা সাহিত্যিক সাধুরীতি, লোক সাহিত্যের তেমন ভাষাগত ভিন্নতা নেই। যে অঞ্চলে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি তারই ভাষা সেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। লোকমুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার কোনো প্রভেদ থাকে না। মানুষের মুখের ভাষায় তার প্রাণের কথা উচ্চারিত হয়। এর ফলে লোকসাহিত্যের মধ্যে যেমন অকৃত্রিম প্রাণাবেগ প্রকাশ পায় তেমনি তার আঞ্চলিক রূপের জন্যই তা সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে না। অঞ্চল বিশেষের সাহিত্য আঞ্চলিক রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সর্বজনবোধ্য সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ অঞ্চলের উচ্চারণরীতি কিংবা ভাষাপ্রয়োগের ফলে তার অর্থ অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয় না। তার আবেদন অনেকটাই স্থানিক হয়ে পড়ে।[১] বাক্যব্যাবহারগত বিশিষ্টতা, শব্দ প্রয়োগ এসবই নিতান্ত আঞ্চলিক রীতির হওয়ার ফলে — অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সহজে তার রসাবেদন গ্রহণকরাও সম্ভব হয় না। অবশ্য কখনো কখনো এই সাহিত্যের কিছু বিষয় আঞ্চলিকতার সীমা ছাপিয়ে ওঠে। প্রথমত কোনো অঞ্চলের বিশিষ্ট কোনো সাহিত্যরূপ অন্যান্য অঞ্চলে প্রচারিত হলে তার প্রতি মানুষের মনোযোগ ক্রমে আকৃষ্ট হয়। এই সাহিত্যরূপ যদি গান হয় তাহলে তার সুরের আবেদন মানুষকে প্রথমে মুগ্ধ করে। পরে সে তার শব্দ বা অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়। তখন আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে সাধারণের উচ্চারণের কাছাকাছি আসে, শব্দের ও বাক্য প্রয়োগের দিকগুলিও পরিস্ফুট হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে সুরের ভূমিকা আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ বা বাক্‌রীতিকে ডিঙিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু যেসব সাহিত্য কথা নির্ভর যে ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করা সহজ হয় না। লোকনাট্য প্রধানত কথা নির্ভর সাহিত্য যদিও সংগীতের ভূমিকা তাতে কম নেই। কিন্তু সঙ্গীত যেখানে নাট্যঘটনার সহায়ক নাট্য সংলাপের একটি রূপ। সংলাপ সেখানে কেবল কথায় বলা হয় না তা গানেও বলা হয়। কাজেই সঙ্গীত সেখানে মনোভাবের প্রকাশাত্মক নয় কাহিনীও ঘটনার প্রকাশের বাহন। এই কারণে লোকনাট্য কদাচ অঞ্চলের সীমা ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের রসাবেদনের বাহন হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই তা সীমাবদ্ধ থাকে।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলির প্রতিষ্ঠাভূমি বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়ানো। যে ভৌগোলিক সীমারেখাকে উত্তরবঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয় তার ভাষাও সর্বত্র একরকম নয়। তবু মোটের উপর লোকসমাজের ভাষার মধ্যে নৈকট্য

আছে। একথা ঠিক কোচবিহারের ভাষা আর পশ্চিমদিনাজপুরের ভাষার মধ্যে প্রয়োগগত বা উচ্চারণগত কিছু প্রভেদ আছে তবু তা বোধগম্যতার স্তর অতিক্রম করে যায় নি। তাই একই ভাষারীতি না হলেও তা বোধগম্যতার মধ্যে থাকায় এক অঞ্চলের লোক এই উত্তরবঙ্গেরই অন্য কোনো প্রান্তের লোকনাট্য উপভোগ করতে পারেন। এর সংলাপ বা সংগীত রস আস্বাদন করতে পারেন। বর্তমান আলোচনায় উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের ভাষার একটি সাধারণ রূপের আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত আঞ্চলিক প্রয়োগরীতিও প্রদর্শিত হবে।

উত্তরবঙ্গের লোক প্রচলিত ভাষায় মান্য চলিতের মতই স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। স্বরধ্বনিগুলির সংখ্যা একইরকম। যদিও তাদের ধ্বনিগত রূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা। অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও, — এই সাতটি স্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। হ্রস্ব দীর্ঘেরও কোনো ভেদ দেখা যায় না। যখন লোকনাট্যগুলি লিখিত আকারে সংগৃহীত হয় তখনই কেবল তার লেখ্যরূপ ধরা পড়ে। নতুবা লোকনাট্যগুলির কোনো লিখিত রূপ থাকেন না। সংগীতের ক্ষেত্রে কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ বা প্লুতও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কথ্য ভাষায় দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ হয় না।

লোকনাট্যের ভাষার ধ্বনিগত রূপ ও তার উচ্চারণ বৈচিত্র্য দেখান হল।

'অ' —

বাংলায় এই ধ্বনিটির উচ্চারণ দু'রকমভাবে হয়। 'অ' এর সাধারণ উচ্চারণ ব্যতীত 'অ' 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হয়। 'অ'-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ — 'ঘরত বোলে কিছুই নাই, এই একিনি ধান পানু, বস্তাটাসুদায় লিয়া আসিচু।" (লোভী জোতদার) "সনার বরণ গৌরচান কথায় গেলে পাব।" (রাজধারী)

'অ' 'ও' এর মতো উচ্চারিত হয় — "অকি (ওকি) বিধাতা কর্মদোষে হারাইলাম গুণের ভাই।" (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

প্রভাত > পোহাত, রমণী > রোমনি

অ-এর উচ্চারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উ হয়। যেমন জন > জুন

অ-এর উচ্চারণ আ হয় যেমন না হয় > না হায়

'আ'-ধ্বনির উচ্চারণ কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘতে পরিলক্ষিত হয়।

"আরে ভাই যাসু যাসু।... মোকে আরহ তোক টানিয়া আনিয়া লাগেচে।" (লোভী জোতদার)

আ > উ, আ > ধ্বনি অতে পরিণত, চেয়ার > চেয়র, বিধাতা > বিধুতা

'ই' এবং 'ঈ' এই দুই ধ্বনির মধ্যে বিশেষ কোনো ভেদরেখা টানা হয় না। তবে 'ই' ধ্বনিই সংগীতে বা সংলাপে দীর্ঘ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় এমনকি তা প্লুতস্বরে গিয়ে পরিণত হয়। "কি ব্যাপার কাকা আজি এত সাকাল সাকাল মোক ডাকায়া ধরিচিত। (লোভী জোতদার)

উ ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

'ঊ'-এর বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় না।

শিক্ষার কি মূল্য স্বামী ধন

কেমনে জানিবেন।

ওনা — কুমারশালে মাটি শুদ্ধ

জমিন শুদ্ধ হয় চাষ দিলে।

ও কখনো অ রূপে উচ্চারিত হয় যেমন — তোমরা > তমরা

'এ' ধ্বনির উচ্চারণ দুরকম — 'এ' এবং 'অ্যা'-এর মতো।

"টাকা ফেরত (এ-র মতো উচ্চারণ) দিলু না মোক অপমান কল্লু।"

"এত টাকা টাকার গরম। আইজ ফের বুঝি ('এ'র উচ্চারণ)।

'ও' ধ্বনির উচ্চারণ মান্য চলিতের মতো।

ও-হো ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতর। পুত্রশোকে বৈসে রাজা ভূমির উপর। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল - কুশান)

ঐ/ঔ দ্বিস্বর ধ্বনি। ঐ - ওই - একই। 'ঔ' ধ্বনি মান্য চলিত বাংলা যেভাবে ব্যবহৃত হয় এখানে তার পরিবর্তে 'ঐ' ধ্বনির প্রয়োগ হয়।

গৌরব > গৈরব — সেহ সীতা না ভাজে শিরামের গৈরবে (রাজধারী)

চৌদিকে > চৈদিকে — চৈদিগে — চৈদিগে নাগর চৈদিগে সাগর তাহার মধ্যে ঘর (রাজধারী)

কৌশিল্যা > কৈশিল্যা — একবার কৈশিল্যার নন্দন হে প্রভু (রাজধারী)

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির প্রয়োগ মোটের উপর মান্য চলিতের মতো। কিছু ক্ষেত্রে তাদের ধ্বনিরূপের পরিবর্তন হয়।

'ক' ধ্বনির শব্দের মধ্যে কখনো কখনো 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হয়।

সনার চাইলন সনা আনিলেন ধরেয়া

পুত্রবধূ বরে নেগায় জয় জোগার (জোকার) দিয়া" (বিষহরি)

'খ' ধ্বনি শব্দের মধ্যে প্রায়শই 'ক' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে আসে।

"দেইকতে দেইকতে, কতলা বচর সেলসেল করি চলি গেইল। মুই এবার নিজের বিয়াও নিজে করিম।' (কুমারী কাঞ্চনবালা)

ত থ দ ধ ন ধ্বনির উচ্চারণ মান্যচলিতের মতো।

শ ধ্বনির উচ্চারণই মুখ্য।

স এর উচ্চারণ দেখা যায় কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহারে।

''ভাসুরটা ঠিকেই কহিগেল। মোর মরদের কথা শুনিলে হবানাহা। ছায়া ছটাক খিলাইয়া দিয়া ইসকুলত পাঠাম।''

স - চ এ পরিণত যেমন কিস্কিন্ধা > কিচকিন্দা (রাম বনবাস)

'দুঃখ' এই জাতীয় শব্দকে ভেঙ্গে 'ক' এবং 'খ' কে পাশাপাশি করে উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা যায়। দোতরা পালা — 'আলম সাধু'-তে আয়েষার একটি গানের মধ্য দিয়ে এরূপ উচ্চারণ প্রকাশ পেয়েছে — ''মনে বড় দুকষরে মরা চিতে বড় দুকষ। তোর জন্য দেখিবার না পাঁও পর পুরুষের মুখ।''

'ক্ষ' এর উচ্চারণ কখনো 'ক' এর মতো আবার কখনো 'ক' এবং 'খ' পাশাপাশি উচ্চারিত।

পূর্বের উক্ত ঐ গানেরই শেষের লাইনে পাই

''তোক হারাচুং বাড়ী হারানু মাও জননী

তোর বাদে না ঝুরে মোর এক চোকের পানি।''

চেক্ষের > চোখের > চোকের (আলম সাধু)

'ক' এবং 'খ' পাশাপাশি থেকে উচ্চারিত শব্দ —

''চলো ঐ যে গ্রামটা দেখা যায় ঐটে কোনা

গিয়া পুঁছি, যদি তোমার কুমারের দেখা পাওয়া যায়। ফির ঐটেকোনা ভিকখাও মিলবে। (ভিক্ষা > ভিক্‌খা)

'ব' এর উচ্চারণ কিছু ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে 'প'-এর মতো যেমন — 'মোর মরণের খপরটা যেমন করি হউক জমিদার কৃষ্ণকান্তক দেইস বৈন।'' (কুমারী কাঞ্চনবালা)

ব — শব্দ মধ্যে গ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত যেমন যুবতী > জুগতী

ব > ভ-বেশ > ভেশ, ব > ফ-দেখবা > দেখফা, রবে > রোভে

নাসিক্য ধ্বনি মালদার লোকনাটক 'গম্ভীরা' ব্যতীত উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার লোকনাটকে অনুসানিক হতে দেখা যায় না।

''চাদের বচনে লেংগা করিল গমন

কর্মকারের গৃহে যাইয়া দিল দরশন।'' (বিষহরি)

আর একটি উদাহরণ দেখানো যেতে পারে যেখানে নাসিক্য ধ্বনি লুপ্ত হয়ে পার্শ্বতী ধ্বনিতে অনুনাসিক পরিণত করেনি।

''ও মুই আছোং কান্দিয়া

বাশীটা তোর ফেলাম ডাঙ্গে ভাংগিয়া।'' (চোর-চুন্নী পালাগান)

র ধ্বনি - অ যেমন রাবাণ > আবান

রান্ধিচে > আন্ধিচে

র ধ্বনি > ন হয়। রোদ > নোদ, রোবু > নোবু

র > ড় — দেরি > দেড়ি

শব্দের আদিতে ল — ন এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন "পোহাতে উঠি ডাকাডাকি নাগালেন। সূর্যঠাকুর নাল হবার ধরিচে।"

'য' এবং 'জ' — এই দুটির উচ্চারণ চলিত বাংলার মতো 'য' কে 'জ'-রূপেই উচ্চারণ করা হয়। রাজধারী লোকনাটকের কিছু চরিত্রের ভিত্তি দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থিত করা যেতে পারে।

"যত (জত) শক্তি আছে বেটা
তত শক্তি ধর।
আজিকার রণে বেটা
তোক পাঠাম যম (জম) ঘর।

ধ্বনি পরিবর্তন —

আদিস্বরাগম — শব্দের প্রথমেই স্বরধ্বনির অবস্থান।

যেমন — "নেখা-পড়া করিতে ইসকুলে (স্কুলে)
পাঠান সবে বাচ্চাগণ।"

মধ্যস্বরাগম —

সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরধ্বনির আগমন লোকনাটকের বহু সংলাপে রয়েছে। যেমন পূর্ব পুরব, শত্রুঘ্ন শত্রুঘন

যদি মোর নাম বংশ ধরম (ধর্ম) আকির চাইস তাহইলে তুই ঐ কতা ভুলি যা।"

অপিনিহিতি — "কর্ত্তা বাবু, আপনি সত্য সত্যই কি এই দ্যাশ ছাইড়া চইলা যাবেন ? (কুমারী কাঞ্চনবালা)

রাক্ষস > রাইক্কস 'ধরিল রাইক্কস মূর্তি। (রাজধারী)

সংকলিত লোকনাটকগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। 'রাজধারী' লোকনাটক থেকে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে —

বাবুরে > বাপফুরে, যুবতী > জুগতী, বেশ > ভেস, অরণ্য > অরণ, রমণী > রোমনি, আযোদ্ধা > অযুতা

আদিস্বর লোপ — আছে > ছে, আছিস > ছিস

আদিব্যঞ্জন লোপ — রান্ধি > আন্ধি, প্রভাত > পোহাত

অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ — অরণ্য > অরণ, মৃত্যু > মিতু, অযোধ্যা > অজুতা, তপস্বী > তপসি

ব্যাকরণ —

কারক বিভক্তি — কারক বিভক্তিতে উত্তরবাংলার লোকনাটকে ব্যবহৃত বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত বিভক্তিগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

"তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকি নামে।" (আলম সাধু, দোতরা পালা)

'রহিম' কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি

'টং থাকি' (টং হতে) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি

'সীতাক লয়ে রাবণ যবে অশোক বনে গেলো।' (রাজধারী)

সীতাক — অক প্রাণীবাচক কর্মে 'অক' বিভক্তি।

প্রথমে যে হইলো বীরের মোর মুখরে গালাগালি। (রাজধারী)

মুখরে — মুখের দ্বারা — করণ কারকে 'দ্বারা' বিভক্তি।

সরবাংগে জ্বলে গেলো মোর অগ্নি দিল গায় (রাজধারী)

গায় > গায়ে — অধিকরণে 'য়' বিভক্তি।

সর্বদানা ফল বৃক্ষের সময়তে ফলে। (রাজধারী)

বৃক্ষের সম্বন্ধ পদ।

ওরে কুঠে হাতে আনিলো জামাই সাদা পাগেলা। (চোর-চুন্নী)

"আগুনের চায়া গরম আরো কেবা।

দুধের চায়া আরো কেবা সাদা।" (শাস্তরী)

ক্রিয়ার কাল —

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ — এই তিনটি কালের ব্যবহার লোকনাটকগুলির সংলাপের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান কাল — সাধারণ বর্তমানের উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। যথা — এই বেটিডাক লিয়ায় বা মোর সংসার। মুই বাপের একেনায় বেটা। (লোভী জোতদার)

"আরে ভাই, যাসু যাসু।" — ঘটমান বর্তমান। (লোভী জোতদার)

"খোব আদরে যতনে মানষি হইচু" — পুরাঘটিত বর্তমান (লোভী জোতদার)

"আইসো আইসো ভাই মোরে

বস রত্ন সিংহাসনে

ত্রিফুল তামাকু মোরে

করহ ভক্ষণরে ভাই বিভীষণ।'' — বর্তমানের অনুজ্ঞার ভাব। (রাজধারী)

অতীত কাল — বড়য় আশা করিয়া বাপটা মোক বেহা থুয়া দিয়া নয়া বহুডার হাতে ভাত শাক নান্ধা খায়া স্বর্গে চলিয়া গেইল। — সাধারণ অতীত। (লোভী জোতদার)

''এই জোতদারীর ভারটা লিবার তানে মুইও একটা বেটা আশা করিসিনু'' — পুরাঘটিত অতীত (লোভী জোতদার)

''জননীর উদরে ছিলাম উত্তর শিয়র করি'' — নিত্যবৃত্ত অতীত (শাস্তরী)

''সত্যযুগে ছিলো নরসিংহ অবতার, গোলকের হরি হিরণ্যকশপ সাংহার করি।'' নিত্যবৃত্ত অতীত (শাস্তরী)

ভবিষ্যৎকাল —

''কায় জানে, অয় এতখান চালাকি করিবে।'' — সাধারণ ভবিষ্যৎ (কুমারী কাঞ্চনবালা)

''যতদিন কুমায়ক পাওয়া না যায় ততদিন উয়ার বাচায় খাবে।'' (বেঁচে থাকতে হবে) ঘটমান ভবিষ্যৎ (কুমারী কাঞ্চনবালা)

''মোক উয়ার অচিনা হয়ায় থাকা হবে।'' (ঘটমান ভবিষ্যৎ)

''এইঠে হামার পরিচয় দিবা লাগে'' — ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

মোর বাপটাক আজি জেহেল হাতে ছুটায় আনবা হোবে। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (লোভী জোতদার)

সর্বনাম —

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম-তুইত ভাই তামানে জানিস, আজি তোর ভাজি মরিবার বার-তের বছর হয় গেল।

তোমহা মরদ লোকলা কেনং সাটাং সাটাং করে বেড়াবে লাগে। তুই মোক পিটায় ঝাটায় আনিবো কি ?

নির্দেশক সর্বনাম — এই চেংরাডার মাও হামার ঘরত আসিবার কথা। এ বাউ তুই চুপ করি রভো। তাহলে ঐলা কিন্তু মোক দিবা হোবে।

অনির্দেশক সর্বনাম — বাবা এতয় দুঃখ দিলেনগে অন্তরে। অক কিছু টাকা পাইসা দিয়া দিসু অয় যাহাতে চুপ করি চলি যায়।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম — কায় জানে, উয়ায় এতখান চালাকি করিবে ? আরে কার বেটা ঐডা দেখিবুতো ?

সংযোগবাচক সর্বনাম — মুই ভগবানটাক আরাধনা করেচু হামার গিরিদারা যেন আরহ গিরি হয়।

সাপেক্ষ সর্বনাম — তুই এলায় যেইঠে একা আসিলো সেইঠে ঘুরিয়া যা।

আত্মবোধক সর্বনাম — আরে মুই দেখিয়া আসিনু নিজের চোখে।

(উদাহরণগুলো 'লোভী জোতদার' পালা নাটক থেকে দেখানো হলো)

লোকনাটগুলোতে অব্যয়ের ব্যবহার —

ওহে রাম বন্দু

হে রাম বন্দু

ওরে মুনি হে

ওগো পিতা লংকেশ্বর

ওকিও মুনি ঠাকুর

ওই মন মানে না গো

আহা হারে মুখ মেলে রাইকষনি

এহে সারথি

গে সর্বনাখা

আরে তুই কে পরিচয় দে।

আরহার সনার হার মংগাইয়া প্রভু।

উহু মুই বুঝবানি পামু

ইহি ভগ্নি সর্বনাখা

অঃ ভাইরে চুসন

(রাজধারী লোকনাটকে ব্যবহৃত অব্যয় পদ)

ওগে নারী হইলো ভাই মায়ার কড়ি।

ওগে হাউস করিয়া যাবার চাছো।

ওগো এলাও কি তুই আছিস নয়া নদারি।

ও তুই চট করিয়া জল ভরিয়া কলসি নেক কাঁখে।

ওরে কি কহিম আর দুঃখের কথা।

যদি চরা না দিবো দেখা।

আর বুঝি মোর প্রাণ বাঁচেনা।

ওরে প্রেম পিপাস তোর গে চুন্নী। ('চোর-চুন্নী' পালাগানে ব্যবহৃত অব্যয়পদ)

আরে এটা একটা ঝগড়া হইল।

হারে এটা তো নুকুনের কথা কহছেন।

যাইতে এক, আসতে দুই

বুঝিমো গে স্বামী, তুই আর মুই।

তোর মাথাত বুদ্ধি আছে রে, ঠিক কহচিস।

ধূপ না লাগি লগি

মুই গেনু বৃক্ষ লাগি

সেই পত্র ঝড়ে পড়েরে

ওহোরে বিধাতা।

('নটুয়া' পালাগানে ব্যবহৃত অব্যয় পদ)

লোকনাটকগুলোতে বাক্যের মধ্যে শব্দদ্বৈতের অর্থ অনুধাবন করতে না পারলে নাটকের চরিত্রগুলির উক্তির মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিছু শব্দদ্বৈতের ব্যবহার দেখানো যেতে পারে —

হে তোর ধাইধাই করে দিছে নাকটা

হোংহোং শব্দেরে গিয়ান প্রেম ওরে ধারা

আরে দিম্‌দিম্‌ তিরসিরা বীর সাজিলরে

ওইযে সাল মুলমুষল বীরের মোর। ('রাজধারী' লোকনাটকে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত)

ভাগে ভাগে দেয় দেখা, দেখ বিষম কালের চাকা

মুই বায়রত দিনু পাও

মাথার উপরা জিটি করে টেঁও টেঁও। ('আলম সাধু' - দোতরা পালায় ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত)

আজস্র শব্দদ্বৈতের ব্যবহার সমগ্র লোকনাটক জুড়ে আছে। এই শব্দগুলোর অধিকাংশই চলিত বাংলা শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। আসলে উত্তরবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে এগুলো রয়ে গেছে। এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বিহার, আসাম, নেপাল এবং ভূটানের দক্ষিণাংশের অনেক দেশী-বিদেশী শব্দ এসে আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন পালা নাটক ধরে উদাহরণ সহযোগে তা দেখানো যতে পারে।

ভাট পালায় ভাটিয়া পালায় চণ্ডাল পালায় হাড়ি।

ঘরের ভিতর যুক্তি করে গাভুর গাভুর আড়ি। (বিষহরি)

আরে রন্ধন করিতে গেল বেহুলা সুন্দরী

তিনটা নারিকেল লইয়া করে টিহ্‌রি। (বিষহরি)

ও কইন্যা ধামনা বসন্তের বেলা

দুই চকখু হইয়াছে ঢেলা। (বিষহরি)

জলের উপর ভুরা টলমল করে

দূর হইতে শঙ্খ সাধু ভুরা দৃষ্টি করে। (বিষহরি)

আমার মনোত কোন কথা

উয়্যার খালি ব্যাড়বেড়ী আর ব্যাড়বেড়ি। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

আরে দোয়ারী তোমার কান আছে নারে ? (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

শিদল ভুকাইম, শালা জমিদারের ঠ্যাং চাটা কুকুর। (কুমারী কাঞ্চনবালা)

ঐ ময়ালে দেখবু একটা মস্ত বড় টং ঐটায়

তোর দাদার ডেরা। (আলম সাধু)

দাড়ি ছুলবুল মুখ ভাকুরা

কাহাসে যাবোরে বন ঠাকুর' (নটুয়া)

ওগে যেইদিনা মুই করো মনে

ধরিস ফেকেনা (চোর-চুন্নী)

ওরে ঝাংগাউ ঝাংগাউ করে দেহা

যেলায় পড়ে ফম রে। (চোর-চুন্নী)

ওগো বড়লোকের মাইয়ার মতন।

শাড়ী পিন্দাম নানান মতন। (চোর-চুন্নী)

চুন্নী যেমন তোর শুয়াতি মাও

ঝঙ্গার ঝঙ্গার করে

আজ ডাঙ্গেয়া ফাটেয়া গাও (চোর-চুন্নী)

লোকনাটকগুলোতে তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দের আগমন ঘটেছে।

তৎসম শব্দের উদাহরণ — সরস্বতী, ভগবতী, চন্দ্র, হস্ত, পঞ্চ, পুষ্প, গর্ভবতী, নিদ্রা, আকাশ, বাতাস, পিতৃসত্য ইত্যাদি বহু তৎসম শব্দ যা কি না সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলার লোকনাটকে চলে এসেছে।

অর্ধতৎসম — লোনাট্যের ভেতরে সংলাপগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্ধতৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার।

পরণাম — প্রণাম > পরনাম

শাংঙ্খা — শঙ্খ > শাংঙ্খা

পরভু — প্রভু > পরভু

সেন্দুর — সিন্দুর > সেন্দুর

বিন্দাবন — বৃন্দাবন > বিন্দাবন।

কান্দন — ক্রন্দন > কান্দন।

আন্ধার — অন্ধকার > আন্ধার

তৎভব শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

শিয়াল — শৃগাল > শিয়াল

চুর — চূর্ণ > চুর

সোয়ামী — স্বামী > সোয়ামী

দেশী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ করি। ডোর, ময়াল, ফাফর, এলুয়া, কাশিয়া, ডেরা, জিটি, ফাওফ্যাচাল, ডাবরি, চেওয়ারী, ঝিয়ারী ইত্যাদি

বিদেশী শব্দ — ভুইচাল, বেটি, বাপু, নিকলনা মুরগা, ইত্যাদি শব্দগুলি হিন্দি থেকে এসেছে।

এছাড়াও একেবারে কিছু অঞ্চলগত শব্দ আছে — যা কি না বিশেষ লোকায়ত সমাজে প্রচলিত। এই শব্দগুলোর মধ্যে কিছু উদাহরণ সহযোগে তোলা হলো — নিয়র, চ্যাংরা, কাগা, ঝেচই (পাখী), দোয়ারী, ফাওফ্যাচাল, ডারাইস, আউকটা, মঞ্জুস, মারেয়া, গাভুর, ঢেনা, টিকর, ডারিকা, আহেলা, চেহর, ছাম, চুরা বাউ, ডাঙ্গুয়া, আচাংচা, ফেকেনা, দুরদুরি ইত্যাদি আরো প্রচুর শব্দ লোকনাটকে দেখা যায়। লোকনাটকের সংলাপে ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য — 'রাজধারী' লোকনাটকে সংলাপের ব্যবহারের পদ্যাকারে সংলাপের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণ চরিত্রগুলি যখন কথা বলেন তখন গদ্যের ব্যবহারই লক্ষ করা যায়। লক্ষ করা যেতে পারে —

বড় বৌ — এ মাই তোক কুনো কহে গিছে ?

ছোট বৌ — মোক কুনেনি কহেগে বাই।

বড়বৌ — দাদাগে দাদ হামার বাপটা তমহার এইতি আইচি না কি গে, তমহা কাহো কভা পারবেন ?

সারথি — কায়, উলাতো মাই তমহার বাপটা খোব বেহানে হামার এই পাকে গিছে।

কখনো কখনো প্রধান চরিত্রগুলি গদ্য কথপোকথনের মধ্য দিয়ে পদ্যাকারের সংলাপে প্রবেশ করেন।

সূর্পনখা (গদ্যরূপে) — গে রাবণদাদা, হা মোর নাকটা কাটিয়া লিছে গে হে রাবণদাদা হা।

রাবণ (গদ্যরূপে) — ইহি ভগ্নী সর্বনাখা, এ দুঃখদশা তোর কে করেছে। সে তুমি প্রকাশ করে বলো রে।

সূর্পনখা (পদ্যরূপে) — ফুল তুলিতে গিসনু দাদা
পঞ্চবটির বনে
ধরিয়া নাক কান

কাটিছে শিরামের ভাই

অনুজ লক্ষ্মণে।

চরিত্রের সংলাপের মধ্যে পদ্যের প্রাধান্যই বেশী।

উত্তরদিনাজপুরের 'খন' লোকনাটক সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে রচিত হয়। এলাকার চলমান ভাষার কথপোকথন গদ্যের আকারে প্রকাশ পায়। বক্তব্যের প্রকাশ সঙ্গীত দিয়ে যখন হয় তখনই ছন্দের মিল পাওয়া যায়।

লক্ষ করা যেতে পারে —

বেঙ্গু — হে সবুজদা। খবর খুবই ভাল। এই যে বাড়ি বাড়ি যাই খবর নিহি কাহার বেটাবেটি ইস্কুলে যায় কাহার যায় নি। তাতে ভাল কাম হইলে — একুন সবাই বেটা-বেটি স্কুল পাঠায়।

এই সময় একজন গান করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন —

শুনেন শুনেন দাদাগণ

শুনেন শুনেন বৌদিগণ

নেখা-পরা করিতে ইস্কুলে

পাঠান সবে বাচ্চাগণ।

লোকনাটকে চরিত্রানুযায়ী ভাষার ব্যবহার দেখা যেতে পারে —

'আলম সাধু' দোতরা পালায় বেগম এবং আয়েষার সংলাপ উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গদ্য সংলাপ শেষ না হতে হতে পদ্যের সংলাপ শুরু হয়। আবার প্রয়োজনমত গানের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

বেগম — দেখ মা, তোক দেখামাত্র রহিম কাটি ফেলাইবে। যদি বাচির চাইস, দাদা-দাদা বলিয়া কেবার কমর জাড়েয়া ধরিলে আর মারির পাবে না। না হইলে তোর মরণ।

আয়ষা — ঠিক আছে মা।

বেগম — দেখ মা আয়ষা, ওই যে ঘোর বনের উপর কেটা বড় গছ দেখা যায় তার ঐ পাড়ে তোর দাদা আছে। ঐ ময়ালে দেখবু একটা মস্ত বড় টং। ঐটায় তোর দাদার ডেরা।

পয়ার — হায়রে, রহিল বেগম সেথা আয়ষা চলিল।

অনেক দূরও যাইয়া আয়ষা উপনীত হইল।

দাদা দাদা বলিয়া আয়ষা পাড়ে ঘন ডাক।

জাগিল নিদ্রার কত হাতী ঘোড়া বাঘ।
গহন বনে শুনে রহিম নারী কণ্ঠস্বর।
এক লম্ফে উঠে রহিম টংগের উপর।।
দাদা বলিয়া আয়ষা রহিম পানে ধায়।
টংএর নিকট গিয়া আয়ষা দাদা পানে চায়।
কে ডাকে দাদা বলি ঘোর বন মাঝারে।
তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকিয়া নামে।

নাটকে চরিত্রের স্বভাব ও কর্মের সঙ্গে মানানসই হয়ে আছে তাঁদের সংলাপ।

ধাইমার সংলাপ —

ধাইমা — বাপরে বাপ মুই যখন আসি পুচ্ছুং আর ভয় কিসের। রাণীমা, তোমার শাড়ীখান মুই গিন্দিয়া তোমার নিদান তড়াইম। আর ঐ শাড়ীখানত যত রাজ্যের পংখী-পয়াল দেকং, ওগিলা মোক ভাঙ্গি কনতো ?

লোকায়ত ভাষায় ধাইমার সংলাপ। যে স্তর থেকে তিনি উঠে এসেছেন সেই স্তরের ভাষা তাঁর শরীর ও মননে গেঁথে রয়েছে।

পাশাপাশি এই পালা নাটকে গাটু নাপিতের সংলাপ একঝলক দেখে নেওয়া যায় —

আয়েষার প্রতি গাটুর উক্তি — জঙ্গলে থাকির লাগিবে না। জাগীরাম বাদশা নিজে মোক ঘটক করিয়া পাঠাইছে। এলাখালি তোমার মতামত বাকি। বাদশা যে তোমাক কোনটে রাখিবে... কন কন তাড়াতাড়ি কয়া ফেলান।

ধূর্ত চরিত্র গাটু নাপিতের কথার ভেতরে রয়েছে কৌশল। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ ফুটে উঠেছে। 'রাম বনবাস' পালা নাটকেও দেখা যাচ্ছে চরিত্রগুলি পদ্যের আকারে কথা বলতে বলতে গদ্য-সংলাপে ঢুকে যাচ্ছে। যেমন —

রাম — শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে যাব আমি বন।
পিতা-মাতা ভাইসহ থাক একস্থানে।
চৌদ্দ বৎসরের জন্য যাব আমি ঐ অরণ্য কাননে।

লক্ষ্মণ — শোন দাদা আমার বচন।

আপনার সঙ্গে আমিও যাব বন।

রাম — ভাইরে লক্ষ্মণ, সত্যিই কি যাবি তুই আমার সাথে পিতৃসত্য পালন করিতে...।

আবার মূল গায়কও কাহিনীকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনমত গদ্য-সংলাপ ব্যবহার করছেন —

মূল গায়ক — বানরের রাজা দুই ভাই কিষ্কিন্ধ্যানগরে সুগ্রীব মেরে বালী বসেন সিংহাসনে।

একই সংলাপের মধ্যে পদ্য ও গদ্যের মিশ্রিত রূপটিও দেখা যায়।

বালী — শোন ভাই সুগ্রীব আমার বচন। আজি নিশীথে দেখিলাম সুস্বপন। কোথাকার দানব এসে আমার ঐ মধুবন ভেঙ্গে চুরমার করেছে। সেই দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাব ভাই দুইজন।

'নটুয়া' লোকনাটকে ধাঁধা বা 'শ্লোক' ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। শ্লোকগুলোকে যাকে এলাকার লোকভাষায় 'ফাকড়ি' বলে তা শিল্পগুণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখা যায় — যা কি না সীমিত এলাকার মধ্যেই প্রচলিত। সেই লোক-সমাজের কাছে 'ফাকড়ি'-কে বিশ্লেষণ করে তার অর্থ উদ্ধার করা হলে বেশ পরিতৃপ্তি আসে।

১। উপরেতে আং সাং
ভিতরে জাবরা
তলপাখে পাছাটা
উপরপাখে ডিমাটা

২। আবরান্তি জাবরান্তি
ভিজান্তি গাও
ধাপোত বসিয়া আছোঁ মুই
মূলের মাও

৩। ঠাকুরঝি ভিটিস কইরলো কি
আখাত ছবা দিচু কাঁটালের বিচি
দুই একটা মাথা হলার ভিতি
এই জুয়াই বেটা
ওখান মোর বাও
তোমার যদি ওখান কও।
তাহলে তোমরা খাও

৪। চ্যাংরাগুলাক উঠায়ে দেও।
আর বুড়াগুলাক ভুকায়ে দেও।

৫। শালবাড়ীত ছিল বীরটা
য্যালা ধরিল বীরটা
বেটি ছাওয়ার পাছ
স্যালা বীরটা ফুকুরদুম ফাকাশ।

৬। ট্যাংনা গিদায় গীত
দরই মাছের নাচন দেখি
ওংগি না পায় থির
শোল মাছের গিবির গাবার
শাল মাছের হুরা
মাথা সঠকায়ে দিচে
পানির তলের দুরা।

৭। আরোয়ার ব্যাটা জারোয়া
কিবা আনলো ঘরে
খরবর খরবর করে
ছোয়া পালালো ডরে
মোর আইছে জ্বরে।

লোকায়ত শব্দ দিয়ে তৈরী শ্লোকগুলির ব্যবহার পালানাটকটিতে দেখা যায়

বিভিন্ন পালানাটক আলোচনা করে লোকনাটকের ভাষার ব্যবহারের রীতি আলোচনা করে দেখানো হলো।

তথ্যসূত্র

১। লোকসাহিত্য ও লোকভাষা : সংযোগ সমস্যা, সনৎকুমার মিত্র, দ্রষ্টব্য : বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান, পৃ:১৪৮